বিষাক্ত ট্যানারি

বাংলাদেশের হাজারিবাগের চামড়া শিল্প: ঝুঁকির মুখে জনস্বাস্থ্য

সার-সংক্ষেপ

যহাজ-এর বয়স এখন ১৭ বৎসর। তার বয়স যখন ১২ বছর ছিল তখন থেকেই হাজারিবাগের একটি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সে কাজ করছে। হাজারিবাগ হলো ঢাকার পাশে অবস্থিত একটি সমন্বিত আবাসিক ও শিল্প এলাকা। এখানে সে দিনে ১০ ঘন্টা (দুপুরের খাবারের এক ঘন্টার বিরতিসহ) শ্রম দিয়ে প্রতিমাসে ৩,০০০ টাকা (৩৭ মার্কিন ডলার) আয় করে। এই ট্যানারিতে আরও ৫০ জনের মতো লোক কাজ করে। তাদের মধ্যে দু'জনের বয়স যথাক্রমে ৭ ও ৮ বৎসর। ট্যানারিতে পশুর চামড়ার বিভিন্ন প্রান্তে পেরেক ঠুকে সেগুলোকে রোদে শুকাতে হয়। সেই কাজটি করানোর জন্যই শিশু দু'টিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

যহাজ হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছে যে, সে মূলতঃ কাঁচা চামড়াকে পাকা চামড়ায় রূপান্তরের প্রাথমিক কাজটি করে। এই স্তরে পরিবর্তিত যে চামড়াটি পাওয়া যায় তা "ওয়েট ব্লু" নামে পরিচিত। এটি করতে গিয়ে তাকে প্রতিনিয়ত নানা ক্ষতিকর রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসতে হয়। ট্যানারিতে চামড়া মজুদ করার জন্য ব্যবহৃত গর্তগুলো চার মিটার বর্গাকৃতির এক একটি ট্যাংক। এখানে কাঁচা চামড়ার পাশাপাশি ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিকের দ্রবণও জমে থাকে। ঐ জায়গায় কাজ করাটা যহাজের বিশেষভাবে অপছন্দের।

> আমরা ভেতরে ঢুকে নিজ হাতে কাঁচা চামড়াগুলোকে তুলে নিয়ে সেগুলো গর্তের বাইরে ছুঁড়ে ফেলি। তখন দস্তানা, বুট পরিহিত থাকলেও পানির ঝাপটা আমাদের গায়ের চামড়ায় ও জামাকাপড়ে এসে লাগে। আমরা কোন এ্যাপ্রন ব্যবহার করি না। গর্তের পানিতে এসিডও থাকে। ফলে আমার গায়ে লাগার সময় চামড়া পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়।

যহাজ এখন চামড়ায় ছোট ছোট লাল ফুসকুড়ি ও চুলকানির সমস্যায় জর্জরিত। বাবা এবং দুই ভাইও ট্যানারি শ্রমিক, তাদেরও আছে একই ধরনের চর্মরোগ। তাহলে কেন সে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে? যহাজের উত্তর - "ক্ষুধার পেটে এসিড তো ব্যাপার না, খেতে তো হবে।"

কাজ করতে গিয়ে যহাজ নানা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। একবার চামড়া শুকানোর একটি পেরেকের উপর ভুলক্রমে সে পা ফেলেছিল। ভারী চামড়ার বোঝা তুলতে গিয়ে একদিন তার পিঠে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। আর একদিন সে চামড়া সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত কাঠের ঘুর্ণায়মান বিশাল এক ড্রামের ভেতরে আটকা পড়েছিল।

> আমি চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলাম, 'কে ড্রামটি চালু করেছে?' মিনিট দুয়েক পরে সেটি বন্ধ করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে আমি বেশ আহত হয়ে পড়ি। আমার মাথায়, পিঠে, বাহুতে তখন অনেকগুলো কাটাছেঁড়া ও আঁচরের চিহ্ন। ড্রামের ভেতরে কাঠের লম্বা তক্তাখণ্ড থাকে যার সাহায্যে চামড়া নরম করা হয়। আর সেসব কাঠের টুকরোই আমার শরীরে অনবরত আঘাত করছিল।

ঢাকার একটি নামকরা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যহাজের হাঁপানি রোগ ধরা পড়ে। সে জানায়, "আমি যেখানে কাজ করি সেখানে রাসায়নিকের বাষ্প বা ধোঁয়া খুবই উৎকট ও ভয়ানক।" অসুস্থ কিংবা আহত হওয়ার কারণে যহাজ যেদিন কাজ করতে পারেনা, সেদিনের জন্য তাকে কোন মজুরি দেওয়া হয়না। এটি বাংলাদেশের শ্রম আইনের লঙ্ঘন। তাছাড়া তার পাঁচ বছরের চাকরি জীবনে সে একবারের জন্যও কোন সরকারি শ্রম পরিদর্শককে ট্যানারিতে আসতে দেখেনি বলে জানিয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের হিসাব মতে, হাজারিবাগে ছোট-বড় মিলিয়ে ১৫০ টির মতো ট্যানারি রয়েছে। এখানে ডজনখানেক শ্রমিক নিয়ে যেমন রয়েছে ছোট ট্যানারি, তেমনি আছে কয়েকশত শ্রমিকের বড় ট্যানারিও। সব মিলিয়ে ট্যানারিগুলোতে প্রায় ৮,০০০ থেকে ১২,০০০ শ্রমিক কাজ করে (প্রতিবছর ঈদুল আজহা আজহার পর চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের শীর্ষ মৌসুমে দুই/তিন মাসের জন্য সংখ্যাটি বেড়ে প্রায় ১৫,০০০ পর্যন্ত চলে যায়)।

বাংলাদেশের মোট ট্যানারির ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ হাজারিবাগে অবস্থিত। ফলে, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ও লোভনীয় এই চামড়া শিল্পে হাজারিবাগ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের ট্যানারিগুলো ২০১১ সালের জুন থেকে ২০১২ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৬৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল জুতা, হ্যান্ডব্যাগ, স্যুটকেস, বেল্ট প্রভৃতি। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইটালি, জার্মানি, স্পেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে এসব পণ্য রপ্তানি করা হয়। গত দশকজুড়ে চামড়া শিল্প খাতের এই রপ্তানি প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি ২০১২ সালের জানুয়ারি এবং মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনের জন্য ১৩৪ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান ট্যানারি শ্রমিক, বস্তিবাসী, স্বাস্থ্যসেবাকর্মী, এনজিওকর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, চামড়া শিল্পের প্রযুক্তিবিদ, এবং রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহকারী।

ইতোপূর্বে যেসব প্রতিবেদন, গবেষণা, সমীক্ষা, জরিপ চালানো হয়েছে এবং এমনকি ১৯৯০ দশকের আগ পর্যন্ত সময়ের সরকারি অনুসন্ধানে যা উঠে এসেছে, সেগুলোকেও এই প্রতিবেদনে সমর্থন জানানো হয়েছে। হাজারিবাগ ট্যানারি ও এর আশপাশের এলাকায় সংঘটিত বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং ট্যানারি শিল্পের নানাবিধ সমস্যা ঐসব প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ আছে। সমস্যাগুলো হলো - বায়ু, পানি এবং মাটিতে শিল্প কারখানার নিয়ন্ত্রণহীন দূষণ; স্থানীয় বাসিন্দাদের নানা অসুস্থতা, শোচনীয় কাজের পরিবেশ, শিশুশ্রম (যেখানে ছেলে ও মেয়ে শিশুরা প্রায়শঃ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে এবং অতি তুচ্ছ মজুরির বিনিময়ে তাদের শ্রম বিক্রি করে) প্রভৃতি।

তবে এই প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আরও যা উঠে এসেছে সেটি হলো, উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে জনসাধারণ অবহিত হওয়া এবং এগুলো ইতোপূর্বে লিপিবদ্ধ করা হলেও বিদ্যমান অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ, হাজারিবাগের ট্যানারিগুলো এমনই আইনপ্রয়োগমুক্ত পরিবেশে যে সরকারের পরিবেশ বা শ্রম আইন সংশ্লিষ্ট নামমাত্র নজরদারিতে কিংবা কোন নজরদারি ছাড়াই সেগুলো পরিচালিত হয়। সরকারি কর্মকর্তারাও এই বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমি বেশ সহজভাবে বললেন, ‘‘হাজারিবাগে তদারকি কিংবা আইন প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা নেই।”

কর্তৃপক্ষের এই নিষ্ক্রিয়তার ফলশ্রুতিতে হাজারিবাগের শ্রমিক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা (যাদের অনেকেই গরিব এবং বস্তিবাসী) একটি দূষিত, দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে বসবাস করতে ও শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছেন, যা তাদের মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে। এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ হলো, হাজারিবাগে পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলো বাস্তবায়ন না করার ব্যাপারে কার্যতঃ এক সমঝোতা জারি থাকা, শ্রমিকদের অবস্থা পরিদর্শনে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত জনবলের অভাব এবং ট্যানারির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের সুসম্পর্ক টিকিয়ে রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ প্রভৃতি।

স্বাস্থ্য সমস্যা

ট্যানারি শিল্পের প্রাক্তন ও বর্তমান শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যার বিবরণ দিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে সেসব সমস্যার প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন। সমস্যাগুলো হলো - অকাল বৃদ্ধতা; ফোসকা পড়া, বিবর্ণ, চুলকানি ও র‍্যাশযুক্ত এবং এসিডে ঝলসানো চামড়া; ক্ষয়ে যাওয়া আঙ্গুল, শরীরে ব্যথা, মাথাঘোরা, বিকৃত বা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যদিও বাংলাদেশের ট্যানারি শ্রমিকদের মধ্যে ক্যান্সারের বিস্তৃতি সংক্রান্ত কোন সমীক্ষার ব্যাপারে অবগত নয়, তথাপি কিছু কিছু বাস্তব ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিয়মিতভাবে রাসায়নিকের সংস্পর্শে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার বাস্তবিকই বেড়েছে। ট্যানারি শ্রমিকদের মাঝে চর্মরোগ এবং শ্বাসকষ্টের মতো অনেক সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা মূলতঃ বিভিন্ন রাসায়নিকের ঝুঁকিপূর্ণ মিশ্রণের সংস্পর্শে বার বার আসার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তারা মূলতঃ রাসায়নিকের পরিমাপ ও মিশ্রণের সময়, ড্রামে কাঁচা চামড়ার উপর এদের প্রয়োগ কিংবা প্রক্রিয়াধীন চামড়া নাড়াচাড়া করার সময় এসব রাসায়নিকের সংস্পর্শে চলে আসেন। কিছু কিছু রাসায়নিক স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। যেমন - সালফিউরিক এসিড ও সোডিয়াম সালফাইড। এসব রাসায়নিক সহজেই দেহকোষ, চোখের ঝিল্লি, চামড়া এবং শ্বাসনালী পুড়িয়ে দিতে পারে। অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ যেমন - ফরমালডিহাইড, অ্যাজোকোলোর‍্যান্টস, পেন্টাক্লোরোফেনল প্রভৃতি নিশ্চিত কিংবা সম্ভাব্য ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ। স্বাস্থ্যের উপর এসব রাসায়নিকের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া একমাত্র এদের সংস্পর্শে আসার বহু বছর পরে দেখা দিতে পারে।

এ ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে ট্যানারির শ্রমিক কর্মচারীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কাছে তাদের গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, তাদের ট্যানারিগুলো দস্তানা, মাস্ক, বুট এবং এ্যাপ্রনের মতো সুরক্ষামূলক অপরিহার্য উপকরণ সরবরাহ করেনি। কোন কোন ট্যানারি এসব জিনিস সরবরাহ করে থাকলেও সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। অন্যান্য কর্মচারীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন যে, ট্যানারিতে পুরনো এবং প্রায় পরিচর্যাহীন যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন সময়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন এবং এসব ব্যাপারে তাদের কোন প্রশিক্ষণ ছিল না বললেই চলে। মধ্য চলিশ উত্তীর্ণ সঙ্গী নামের মানুষটি কাঁচা চামড়ায় চাপ প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত একটি বিশালাকৃতির গরম প্লেটের সাথে তার দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার বিবরণ দেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে তার সাক্ষাৎকারের নয় দিন আগে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল।

আমি কাঁচা চামড়াটি মেশিনে পুড়ে দিই, কিন্তু এরপর দেখি যে সেটি কিছুটা কুঁচকে গেছে। ফলে চামড়াটিকে ঠিকঠাক করার জন্য আমি সেখানে আমার হাত ঢুকিয়ে দিই। প্যাডেলের উপর কোন চাপ প্রয়োগ করা না হলেও মেশিনের প্লেটটি আমার হাতের উপর আছড়ে পড়ে। মেশিন ঠিকভাবে কাজ করছিল না.....। আঘাত পেয়ে আমি আর্তনাদ করে উঠি। আমার হাতের বিভিন্ন অংশ থেকে মাংস খসে পড়তে লাগল।

যেসব ট্যানারি শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের কারও কাছে কোন লিখিত নিয়োগপত্র ছিল না। কিছু কিছু ট্যানারি ব্যবস্থাপক শ্রমিকদের আইনগতভাবে স্বীকৃত অধিকারগুলো অস্বীকার করে থাকেন। উপেক্ষিত এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে সবেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি ভোগের সুযোগ, অসুস্থ বা আহত হলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া ইত্যাদি।

হাজারিবাগের ট্যানারিগুলোতে প্রায় ক্ষেত্রে নীচতলায় কাঁচা চামড়া পাকা (প্রক্রিয়াজাত) করার প্রথম পর্বটি সম্পন্ন হয়। কাঠের বড় ড্রাম ও গর্তের মধ্যে চামড়াগুলোকে রেখে এই কাজ করা হয়। এরপর বৃহৎ ও বহুতল বিশিষ্ট ট্যানারিগুলো ''ওয়েট ব্লু'' নামে পরিচিত সেসব চামড়াকে শুষ্ককরণ কিংবা বড় যন্ত্রের সাহায্যে পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নীচতলা থেকে উপর তলায় স্থানান্তর করে। আর ছোট ট্যানারিগুলো ''ওয়েট ব্লু'' পর্যায়ের চামড়াকে অন্য ট্যানারির কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে যেখানে প্রক্রিয়াজাতকরণের অবশিষ্ট সব কাজ সম্পন্ন হবে। হাজারিবাগের অনেক ট্যানারি অত্যন্ত গরম ও গুমোট। তাছাড়া মেশিনের বিকট আওয়াজ এবং রাসায়নিকের বাষ্প ও ধোঁয়া নির্গমনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার সমস্যা তো আছেই।

সময় স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ হাজারিবাগের সকল ট্যানারি মালিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ থেকে বিরত ছিল। তবে সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে ট্যানারি এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তা, এনজিওকর্মী সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে, পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পন্ন বর্জ্য পরিশোধনাগার হাজারিবাগের কোন ট্যানারিতে নেই।

এর ফলশ্রুতিতে, ট্যানারির মেঝের উপর প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক বর্জ্য জমে থাকে। হাজারিবাগের রাস্তায় এবং পাশের ডোবা-নালাগুলোতেও এসব রাসায়নিক বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ে, যা পরে ছোট ছোট জলপ্রবাহের সাথে ঢাকার অন্যতম প্রধান নদী বুড়িগঙ্গায় গিয়ে মেশে। সরকারি হিসাব মতে, হাজারিবাগের ট্যানারিগুলো প্রতিদিন ২১,৬০০ কিউবিক মিটারের অপরিশোধিত ময়লা ও দূষিত পানি ত্যাগ করে। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের

জনস্বাস্থ্য দিন দিন আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে বর্জ্য মিশ্রিত পানিতে দূষণ মাত্রার যে অনুমোদিত সীমা রয়েছে ট্যানারির ময়লা আবর্জনার ক্ষেত্রে দূষণের সেই মাত্রা আরও বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দূষণের পরিমাণ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বহু হাজার গুণ বেশি।

ট্যানারির চারপাশে ঘিঞ্জি রাস্তা বরাবর কিংবা সরু অলিগলিতে বসবাসরত লোকজন তাদের নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এসব এলাকায় ট্যানারি থেকে ঘন কালো বর্জ্য মিশ্রিত পানি প্রবল বেগে নির্গত হয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে উন্মুক্ত ডোবা-নালাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার বাসিন্দাদের অনেকে নানা স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা সত্ত্বেও টাকা-পয়সার অভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে কি ধরনের রোগে তারা ভূগছেন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করাও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। স্থানীয় বাসিন্দারা যেসব রোগের কথা বলেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বর, ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্টের সমস্যা, চর্মরোগ, পেটব্যথা, চোখের সমস্যা প্রভৃতি। এসব রোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলোর কিছু ভূমিকা হয়তো আছে। কিন্তু বিভিন্ন জরিপে লিপিবদ্ধ ট্যানারি দূষণের মাত্রা, স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আলোচনা ও গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একই ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থাযুক্ত পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর তুলনায় হাজারিবাগে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি। ফলে ট্যানারি দূষণ এবং বিপন্ন জনস্বাস্থ্যের মধ্যে একটি গভীর কার্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে বলে জোরালোভাবে প্রতীয়মান হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা আরও জানিয়েছেন যে, এলাকায় পরিবেশ দূষণের মাত্রা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই বলে তারা বেশ উদ্বিগ্ন। কারণ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ থেকে দূষণের বিষয়টি তদারকি করা হয় না। বিবাহিত এবং চার সন্তানের জনক এহ্শার বলেন:

> যে পানি আমাদেরকে সরবরাহ করা হচ্ছে তা নিয়ে আমি বেশ চিন্তিত.....। ঢেউটিনগুলো (বাড়িঘর নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত) ছয় মাসের মধ্যেই ক্ষয়ে যায়। এ বিষয়টিও আমাকে উদ্বিগ্ন করে। আমি এসব বিষয়ে আরও ব্যাপকভাবে জানতে আগ্রহী। কিন্তু আমাকে কখনও পানি, বায়ু ও মাটি সম্পর্কে কোন তথ্য জানানো হয়নি।

আইন প্রয়োগে ব্যর্থতা

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা পরিবেশ আইনগুলো হাজারিবাগে প্রয়োগ না করার ব্যাপারে কার্যতঃ এক ধরনের সমঝোতা জারি থাকার কথা সবিস্তারে বলেছেন। কারণ সরকার ট্যানারিগুলোকে স্থানান্তরের জন্য

হাজারিবাগের পশ্চিম দিকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে সাভারের একটি এলাকাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করছে। কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে, উল্লেখিত সমঝোতার কারণে তারা হাজারিবাগের পানি, বায়ু ও মাটি দূষণের ব্যাপারটি যেমন নিয়মিতভাবে তদারকি করেন না, তেমনি অপরিশোধিত বর্জ্য ফেলার অপরাধে ট্যানারি মালিকদের বিরুদ্ধে কোন জরিমানা কিংবা অন্যান্য বিধিনিষেধও আরোপ করেন না।

সাভারে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তরের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানটি প্রস্তুত করার জন্য গৃহীত সরকারি পরিকল্পনাও ধারাবাহিক দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হয়েছে। সর্বসাম্প্রতিক সময়সীমা (এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত) অনুযায়ী ২০১৩ সালের শেষ নাগাদ পর্যন্ত ট্যানারিগুলোকে সাভারে স্থানান্তর করা যাবে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার যে লম্বা ইতিহাস সেটিকে বিবেচনায় নিয়ে চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন ২০১৫ সালের আগে এই স্থানান্তর সম্ভব হবে না। আবার অন্যদের মতে, ২০১৭ সালেই হয়তোবা এই স্থানান্তর সম্ভব হতে পারে, তার আগে নয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০১২ সালের মে মাসে যখন সাভার পরিদর্শন করে তখন পর্যন্ত সেখানে কোন ট্যানারি নতুন স্থাপনা তৈরীর কাজ শুরু করেনি।

দেশের ট্যানারি শিল্পের প্রধান দু'টি সংগঠন ২০০৩ সালে সরকারের সাথে ঐকমত্যে পৌঁছায় যে, হাজারিবাগের প্রায় ১৫০টি ট্যানারি নিয়ে পরিচালিত শিল্প খাতটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে। বাংলাদেশ সরকার এসব ট্যানারি স্থানান্তর বাবদ কিছু ক্ষতিপূরণ বা ব্যয়ভার বহনেও সম্মত হয়। তবে ট্যানারি শিল্পের উভয় সংগঠনের কর্মকর্তারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানিয়েছেন যে, সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ইতোপূর্বে প্রতিশ্রুত অর্থের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ আদায়ের জন্য তারা দেন-দরবার চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ফিনিশ্‌ড লেদার, লেদার গুডস্ এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ২০১২ সালের জুন মাসে হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, তাদের সংগঠন আশাবাদী যে সরকার তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ করবে। আর দাবি-দাওয়া পূরণে ব্যর্থতার অর্থ হলো, "ট্যানারিগুলোকে স্থানান্তর করা আর সম্ভব হবে না এবং এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে।"

তদারকির অভাব

পরিবেশ অধিদপ্তর যখন হাজারিবাগে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ না করার ব্যাপারে কার্যতঃ এক ধরনের সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করছে, তখন শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তারা নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে বলছেন, "হাজারিবাগের ট্যানারিগুলোর দিকে আমরা খুব কমই নজর দিতে পারি"। কর্মকর্তাদের

ব্যাখ্যা হলো, ঢাকার প্রায় ১ লক্ষ শিল্প কারখানা মনিটর করার জন্য তাদের মাত্র ১৮ জন পরিদর্শক আছেন। তাই হাজারিবাগের ট্যানারি মালিকেরা শ্রম আইন মেনে চলছেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা পরিদর্শন বিভাগের দায়িত্ব হলেও প্রয়োজনীয় জনবল ও সম্পদের ঘাটতির কারণে তারা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানানো হয় যে, কারখানা পরিদর্শকরা কোন কোন ট্যানারি পরিদর্শনে এলেও আজ পর্যন্ত কোন ট্যানারিই শ্রম আদালতে শাস্তির মুখোমুখি হয়নি। অন্য একজন কর্মকর্তা বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, পরিদর্শকেরা ট্যানারি ম্যানেজারদের সাথে সুসম্পর্কের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং সে কারণে পরিদর্শনে যাওয়ার বিষয়টি আগেভাগে নোটিশ পাঠিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেন।

বাংলাদেশ হাইকোর্টের ২০০১ সালের একটি রুলিং অনুযায়ী, সরকারের উচিত ছিল হাজারিবাগের ট্যানারিগুলো যাতে এক দশকেরও আগে তাদের বর্জ্য শোধনের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করে তা নিশ্চিত করা। কিন্তু সরকার হাইকোর্টের সেই রুলিংকে আগ্রাহ্য করেছে। এরপর হাইকোর্ট ২০০৯ সালে জারীকৃত একটি আদেশে বলেন যে, সরকারের উচিত হাজারিবাগের ট্যানারিগুলোকে যাতে ঢাকার বাইরে সরিয়ে নেওয়া অথবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করা। সরকার এবং ট্যানারি শিল্পের সংগঠনগুলো এই আদেশ কার্যকর করার সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েক দফা আবেদন জানায় এবং সেসব আবেদন মঞ্জুরও হয়। কিন্তু বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা হাইকোর্টের আদেশটিকেই উপেক্ষা করে।

আদেশ কার্যকরের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দায়ের করা একটি আবেদনে যে আইনজীবী ট্যানারি এসোসিয়েশনগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি হলেন শেখ ফজলে নূর তাপস। তিনি সরকারের একজন সদস্য এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে হাজারিবাগ এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি বা আইন প্রণেতা। সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও ভাগ্নে।

বাধ্যবাধকতা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী দেশের নাগরিকদেরকে যে কোন হয়রানি বা অন্যায্যতা থেকে রক্ষার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিও এর

আওতায় পড়েন। হাজারিবাগের অনেক ট্যানারিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিরাজ করছে। যহাজের মতো শিশুরা এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (যা সংক্ষেপে আইসিইএসসিআর নামে পরিচিত) নিজ নিজ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মান উপভোগের অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (সিইএসসিআর), যার অন্যতম কাজ হলো আইসিইএসসিআরকে ব্যাখ্যা করা, শ্রমজীবী মানুষদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর বাধ্যবাধকতার কথা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে।

সিইএসসিআর তার ব্যাখ্যায় আরও বলেছে যে, যদি সরকার স্বাস্থ্যের অধিকারের লঙ্ঘন রোধকল্পে কর্পোরেশনগুলোর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে বা তদারকিতে ব্যর্থ হয় তাহলে এর দ্বারা স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ মান অর্জনের অধিকার সরকারগুলো লঙ্ঘন করছে বলে গণ্য হবে। "শিল্পকারখানার পানি, বায়ু ও মাটি দূষণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে ব্যর্থতাও" এর অন্তর্ভুক্ত। একটি স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন যাপনের অধিকারও স্বাস্থ্যের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিকারের সাথে "অ-নিরাপদ ও বিষাক্ত পানি থেকে যে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরী হয় সেটি রোধ করার জন্য" রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি সম্পৃক্ত।

নানা হয়রানি ও অন্যায্যতা থেকে নিজ দেশের নাগরিকদের রক্ষায় জাতীয় পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক যেসব আইন রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনে ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষার যেসব অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, নিজের নাগরিকদের ক্ষেত্রে সেসব অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বও সরকার পালন করছে না। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের উল্লেখিত আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে সরকারের ব্যর্থতা একটি কার্যকর আইনী প্রতিকার প্রাপ্তি থেকে হাজারিবাগের স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে বঞ্চিত করেছে। অথচ এই ট্যানারির কারণে তারা প্রতিনিয়ত নানা স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন।

সরকারি মহলে ব্যাপক আলোচিত একটি অনুমান বা প্রত্যাশা হলো - সাভারে পরিকল্পিতভাবে একটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মিত হলে হাজারিবাগ ট্যানারির সাথে সম্পর্কিত পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সমস্যার মতো বিষয়গুলোর একটি সুরাহা হবে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ স্বীকার করে যে, একটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (Central Effluent Treatment Plant বা CETP) নির্মিত হলে সেখানে সাভারের ট্যানারিগুলো তাদের বর্জ্য পরিশোধন করতে পারবে। তবে, এর জন্য ইতোমধ্যে পরীক্ষিত এবং ব্যাপক সমাদৃত বিকল্প ব্যবস্থা

এবং প্রযুক্তিও বাজারে এসে গেছে, যেগুলোর সাহায্যে ট্যানারির দূষণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমানো যায়। আর সেজন্য কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) নির্মাণের প্রয়োজন পড়ে না। বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে হাজারিবাগে পরিবেশ আইনগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করার কোন ব্যবস্থা যেমন নেই, তেমনি উল্লেখিত নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ট্যানারিগুলোর দূষণ হ্রাস সংক্রান্ত কোন প্রণোদনাও বরাদ্ধ নেই।

এই প্রতিবেদনে চিহ্নিত অধিকাংশ সমস্যার সমাধান কোন একটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের মাধ্যমে সম্ভব হবে না। চিহ্নিত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের নাজুক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং হাজারিবাগে বিদ্যমান শিল্প-দূষণ। এমনকি সিইটিপি নির্মাণের পরও এই ঝুঁকি থেকে যাবে যে, যথাযথ নজরদারি কিংবা আইন প্রয়োগের অভাবে ট্যানারিগুলো সহজেই সেটি ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। আসল কথা হলো, এই প্রতিবেদনে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র একটি কারিগরী স্থাপনার মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

সিইটিপি নির্মাণের বর্তমান অবস্থা যাই হোক না কেন, বাংলাদেশ সরকারের উচিত হাজারিবাগের সব ট্যানারিকে নিবিড়ভাবে মনিটর করাসহ নিয়মানুযায়ী যাতে সেগুলো পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা। এর পাশাপাশি দেশের শ্রম এবং পরিবেশ আইনগুলোকেও সেখানে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক। যদি তা করা হয় তাহলে সেটি হবে এই প্রতিবেদনে চিহ্নিত বহু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চিহ্নিত এসব সমস্যার কয়েকটি হলো - কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান নাজুক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পরিবেশ, সবেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি কিংবা আহত হলে ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রভৃতি।

হাজারিবাগের ১৫০টি বা তার কাছাকাছি ট্যানারির প্রত্যেকটির সাথে সময় ও সামর্থ্যের বিচারে আলাদা অনেক ক্রেতার চুক্তি থাকতে পারে। তাই এই প্রতিবেদনে বিশেষ কোন ট্যানারির কাজের পরিবেশের উপর কিংবা হাজারিবাগ থেকে চামড়া সংগ্রহকারী কোন আন্তর্জাতিক কোম্পানির ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়নি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিশ্বাস করে যে, হাজারিবাগের সকল ট্যানারির উপর বাংলাদেশের পরিবেশ ও শ্রম আইনের টেকসই প্রয়োগ নিশ্চিত করাটাই হবে এই প্রতিবেদনে চিহ্নিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে উত্তরণের আশাব্যঞ্জক উপায় বা কর্মপন্থা।

অনেক বিদেশী কোম্পানি হাজারিবাগে উৎপাদিত চামড়া সংগ্রহ করে থাকে। এখানকার বাসিন্দারা যাতে আর কখনও ক্ষতিকর রাসায়নিকের কিংবা অন্য কোন দূষণের শিকার না হন এবং ট্যানারির শ্রমজীবী মানুষেরা

যাতে একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার সুযোগ পান তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এসব বিদেশী কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। তাদের উচিত পণ্য সংগ্রহের সূত্রে তারা যে নিয়ন্ত্রণহীন দূষণ, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনের লঙ্ঘন কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রমের সাথে সম্পর্কিত নন সেটি নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। চামড়ার সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সাব-কন্ট্র্যাক্ট প্রাপ্ত ট্যানারিগুলোর সাথে লেনদেনের সম্পর্কও এর অন্তর্ভুক্ত।

চামড়া শিল্পে আইন বা নিয়ম কানুন প্রয়োগের বিরুদ্ধাচরণকারী সমালোচকেরা কিছু যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। তাদের মতে, বাংলাদেশ একটি দরিদ্র রাষ্ট্র। তাই উল্লেখিত আইন ও নীতিমালা প্রয়োগের ফলে যদি ট্যানারি শিল্প বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য বাংলাদেশের থাকবে না। তবে হাজারিবাগের সকল ট্যানারিতে শ্রম ও পরিবেশের আন্তর্জাতিক মান এবং দেশীয় আইনগুলো অনুসরণের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে চামড়া শিল্পখাতকে একটি যুগোপযোগী এবং আধুনিক শিল্পখাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ রয়েছে। তখন সেটি সুস্থ এবং অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পরিবেশে উচ্চ মূল্যের এবং উচ্চ মানের চামড়া উৎপাদনের সামর্থ্য সম্বলিত আধুনিক শিল্পখাত হিসেবে বিকশিত হবে। সেরূপ পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে সেটি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশমান এই খাতকে অবমূল্যায়নের পরিবর্তে বরং একটি শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে।

সুপারিশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি

- হাজারিবাগের সকল ট্যানারির প্রতি অনতিবিলম্বে ঢাকা শহরের বাইরে নিজেদের স্থানান্তর শুরু করার জন্য আদেশ জারী করুন ।
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭) অনুসারে, যাতে স্থানান্তরিত ট্যানারিসহ সকল ট্যানারি তাদের ‘‘লাল’’ ক্যাটাগরিভুক্ত (ব্যাপক দূষণ সৃষ্টিকারী) শিল্প ইউনিটের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আবশ্যিকভাবে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ করে, তা নিশ্চিত করুন । অন্যথায় এসব ট্যানারি বন্ধ করে দিন ।
- অনতিবিলম্বে শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন বিভাগের পরিদর্শক এবং সহকারি পরিদর্শকের সকল শূন্যপদ পূরণ করুন । দুই বৎসরের মধ্যে এই বিভাগের জনবল এবং সম্পদ (বেতন ভাতার উন্নয়নসহ) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করুন, যাতে পরিদর্শন বিভাগ অঘোষিত পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে আরও নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ/নজরদারিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে ।
- নীচে উল্লেখিত অপরাধসমূহের বিপরীতে আরও কঠোর জরিমানা বা শাস্তি নির্ধারণের জন্য শ্রম আইন সংশোধন করুন:
    - মৃত্যু, গুরুতর শারীরিক ক্ষতি কিংবা ‘‘শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য যে কোন আঘাত বা বিপদের’’ কারণ হওয়া;
    - ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কোন শিশু বা কিশোর/কিশোরীকে নিয়োজিত করা;
    - আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত সকল অপরাধ ।

- চাকুরি ও কাজে নিয়োজিত হওয়ার ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন নং ১৩৮ অনুমোদন করুন ।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতি

- ট্যানারি স্থানান্তরের পরিকল্পনা যে পর্যায়ে থাকুক না কেন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭) -এর যেসব বিধান হাজারিবাগে জাতীয় দূষণ মাত্রা অতিক্রমকারী সকল ট্যানারিকে মনিটর করার অনুমোদন দেয়, সেগুলো বাস্তবায়ন করুন ।

মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদনকারী কিংবা ক্ষতিকর রাসায়নিকের অতিরিক্ত মিশ্রনযুক্ত বর্জ্য নিঃসরণকারী ট্যানারিগুলোকে প্রাধান্য দিন ।

- ট্যানারি স্থানান্তরের পরিকল্পনা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭) -এর যেসব বিধান হাজারিবাগে জাতীয় দূষণ মাত্রা অতিক্রমকারী সকল ট্যানারির উপর জরিমানা আরোপের অনুমোদন দেয়, সেগুলো বাস্তবায়ন করুন ।
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭) অনুসারে "লাল" ক্যাটাগরিভুক্ত (ব্যাপক দূষণ সৃষ্টিকারী) শিল্প ইউনিটের জন্য বাংলাদেশের সকল ট্যানারি যাতে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করুন । প্রয়োজনবোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং/অথবা প্রয়োজনীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা নিয়ে পরিবেশ ছাড়পত্রহীন ট্যানারিগুলোকে বন্ধ করে দিন ।
- হাজারিবাগে বিরাজমান পরিবেশগত ক্ষতি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির মতো সমস্যা রোধ করতে সাভারের নতুন ট্যানারি অঞ্চলের জন্য একটি সুসমন্বিত পরিবেশগত কৌশল/পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন ।
- ভূ-উপরিস্থ পুকুর, ট্যানারির বিশাল বর্জ্যক্ষেত্র এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের প্রধান নালাগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে হাজারিবাগের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক পরিবেশ বিশুদ্ধিকরণ কৌশল প্রণয়ন করুন । ভূ-উপরিস্থ যেসব মাটি মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত হয়েছে সেগুলো অপসারণ করে তার জায়গায় দূষণমুক্ত মাটি প্রতিস্থাপন করুন ।
- হাজারিবাগের ভূ-গর্ভস্থ পানির দূষণ সক্রিয়ভাবে প্রতিনিয়ত মনিটর করুন ।
- হাজারিবাগের বাসিন্দারা যাতে সেখানকার পরিবেশ দূষণের মাত্রা এবং জনস্বাস্থ্যের উপর এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকতে পারে তা নিশ্চিত করুন ।
- হাজারিবাগের স্কুলগুলোতে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি চালু করে সেসব বিষয়ে শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতি

- হাজারিবাগের এবং সাভারে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেখানকার সকল ট্যানারি যাতে শ্রম আইন (২০০৬) মেনে চলে তা নিশ্চিত করতে জরুরি ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করুন । সেক্ষেত্রে শ্রম আইনের নিম্নোক্ত বিধিগুলোও মেনে চলতে হবে:

- শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা,
- অসুস্থতাজনিত ছুটিসহ সব ধরনের সবেতন ছুটি,
- আহত হলে ক্ষতিপূরণ (কর্মক্ষেত্রের রোগব্যাধিসহ),
- বর্জ্য এবং ময়লা পানির কার্যকর অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা।

- ফ্যাক্টরির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাতের জন্য শ্রম পরিদর্শকদের দ্বারা আগাম সময় চাওয়ার যে নিয়ম প্রচলিত আছে তা সংশোধন করুন। অঘোষিত পরিদর্শন পরিচালনার জন্য শ্রম পরিদর্শকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান করুন।
- ট্যানারির শিশু শ্রমিকদের জন্য অনতিবিলম্বে একটি কার্যকর প্রত্যাহার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করুন। এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকবে: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণসহ শিক্ষালাভের সুযোগ; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প আয়-উপার্জনের সুযোগ সুবিধা; এবং শিশুদের পরিবারগুলোর জন্য আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি। যেসব শিশু রাসায়নিক দ্রব্য, ট্যানারির যন্ত্রপাতি এবং চামড়া কাটার ব্লেড নিয়ে কাজ করছে তাদেরসহ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত সকল শিশুকে উল্লেখিত কর্মসূচিতে প্রাধান্য দিন। ইতোপূর্বে গৃহীত কর্মসূচিগুলো থেকে বাদ পড়েছে এমন শিশুরা যাতে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করুন। সাধারণত এভাবে বাদ পড়া শিশুরা হলো পূর্ণকালীন শ্রমে নিয়োজিত শিশুকর্মীসহ এই প্রকল্পের কাজে সহায়তা দিতে অনিচ্ছুক মালিকদের সাথে থাকা এবং ট্যানারিতে বসবাসরত শিশুরা।
- ট্যানারিতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিরোধী প্রচলিত আইনগুলোকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করুন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মনিটরিং এবং অঘোষিতভাবে সরেজমিন পরিদর্শনসহ আইন ভঙ্গকারী ট্যানারি মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর জরিমানা আরোপের মাধ্যমে উক্ত আইগুলো কার্যকর করুন।
- শ্রম পরিদর্শকদেরকে শিশুশ্রম বিশেষজ্ঞের সহায়তাসহ সকল ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন, যাতে তারা হাজারিবাগের ট্যানারি শিশুদের ক্ষেত্রে শ্রম আইন বাস্তবায়নের মান কার্যকরভাবে মনিটর করতে পারেন।
- ট্যানারি মালিকগণ যাতে নিজেদের ট্যানারিতে কর্মরত সকল শিশুর বয়সের প্রমাণপত্র সংরক্ষণ এবং চাহিদা অনুযায়ী সেগুলো দাখিল করেন তার জন্য মালিকদের উপর প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করুন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতি

- হাজারিবাগের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সমস্যা (এবং ট্যানারি সাভারে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ঐ এলাকার বাসিন্দাদের অনুরূপ স্বাস্থ্য সমস্যা) মোকাবেলা ও প্রতিহত করার জন্য একটি ব্যাপক ভিত্তিক জনস্বাস্থ্য কৌশল প্রণয়ন করুন ।
- জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্যান্সার নিবন্ধন বিভাগ যাতে রোগীদের পেশা ও বর্তমান ঠিকানা অনুসারে বিভাজিত তথ্য-উপাত্ত থানা/উপজেলা পর্যায়ে সংগ্রহ এবং সহজলভ্য করার ব্যবস্থা চালু রাখে তা নিশ্চিত করুন ।

হাজারিবাগ থেকে চামড়া বা চামড়াজাত পণ্য সংগ্রহকারী বিদেশী কোম্পানিগুলোর প্রতি

- ট্যানারিগুলোতে যাবতীয় চামড়া এবং/অথবা চামড়াজাত পণ্য যাতে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী এবং বাংলাদেশের পরিবেশ ও শ্রম আইন মেনে উৎপাদিত হয় তা নীচে উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করুন:
    - পণ্য সরবরাহকারী ট্যানারিগুলোর উপর একটি বিশ্বাসযোগ্য তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সামাজিক ও পরিবেশগত পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ (এসব ট্যানারির যাবতীয় বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচা চামড়া 'ঠিকা কাজ' হিসেবে অন্য যেসব ট্যানারি প্রক্রিয়াজাত করে থাকে সেগুলোও এই পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে) ।
    - পণ্য সরবরাহকারী ট্যানারিগুলোকে সরেজমিনে পরিদর্শন (এসব ট্যানারির যাবতীয় বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচা চামড়া 'ঠিকা কাজ' হিসেবে অন্য যেসব ট্যানারি প্রক্রিয়াজাত করে থাকে সেগুলোও এই পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে) ।
- আন্তর্জাতিক মান এবং বাংলাদেশের পরিবেশ ও শ্রম আইনের বরখেলাপ করে যেসব ট্যানারি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তাদের সাথে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও লেনদেন বন্ধ করুন ।

বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দ্বি-পক্ষীয় এবং বহু-পক্ষীয় দাতা সংস্থাসমূহের প্রতি

- ভূ-উপরিস্থ জলাধার, ট্যানারির বিশাল বর্জ্যক্ষেত্র, বর্জ্য নিষ্কাশনের প্রধান নালা এবং ভূ-উপরিস্থ দূষিত মাটি অপসারণ ও নিরাপদ মাটি পুনঃস্থাপনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে হাজারিবাগের জন্য একটি ব্যাপক ভিত্তিক পরিবেশ বিশুদ্ধিকরণ কৌশল প্রণয়ন ও প্রয়োগে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন ।